মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৬ সংখ্যা: ১
কার্তিক ১৪২৬॥ অক্টোবর ২০১৮
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২০
Issue DOI: 10.62328/sp.v56i1

DOI: 10.62328/sp.v56i1.10
প্রবন্ধ জমাদান: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ অক্টোবর ২০২০
প্রবন্ধ প্রকাশ: ১ ডিসেম্বর ২০২০
পৃষ্ঠা: ২৫৩-২৭০

হাসান আজিজুল হকের স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ

জোবায়ের আবদুল্লাহ
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা সিটি কলেজ, ঢাকা
ইমেইল: qzobayer@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১)। বাংলা ছোটগল্পধারায় তিনি প্রদর্শন করেছেন অবিসংবাদী কৃতিত্ব। রাঢ়বঙ্গের জীবন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জনজীবন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাঁর গল্পভুবন। সমাজের সাধারণ মানুষ, বিশেষত নিম্নবর্গ মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনবাস্তবতা তাঁর গল্পসমূহে শিল্পসত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালেই প্রকাশিত তাঁর অধিকাংশ গল্প। আর এসব গল্পে রূপময় হয়েছে এদেশের শ্রমজীবী নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বসংকট ও তাদের অস্তিত্বসংগ্রামের বহুমাত্রিক রূপচিত্র। নিম্নবর্গ মানুষের বিপন্নতা ও বিষণ্নতা, তাদের ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের অন্তহীন দুর্ভোগের চিত্র উঠে এসেছে তাঁর গল্পের পরতে পরতে। বর্তমান প্রবন্ধে হাসান আজিজুল হকের স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বসংকটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বিশ শতকের ষাটের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে যে কজন কীর্তিমান কথাকারের আবির্ভাব ঘটেছিল হাসান আজিজুল হক ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। ভারত-ভূভাগে জন্ম নেওয়া এই কথাসাহিত্যিক সাহিত্যসাধনার উন্মেষ-পর্ব থেকেই ছিলেন প্রখরভাবে বাস্তবতা-সচেতন। নন্দনতাত্ত্বিক খোলস রক্ষা করেও বিষয়বস্তুর প্রশ্নে কল্লোলের লেখকদের মতো তিনিও নিম্নবর্গ মানুষের জীবনকে তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য করে তুলেছেন। ফলত গ্রামীণ আর্থসামাজিক প্রতিকূলতায় নিষ্পিষ্ট নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বসংকট, তাদের সংগ্রামশীলজীবনচিত্র তাঁর গল্পে অর্জন করেছে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি। দেশভাগ ও দেশত্যাগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়, সামরিক স্বৈরশাসন, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ প্রভৃতি ঘটনাক্রমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাঋদ্ধ হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পশিল্পে এসব ঘটনার অভিঘাত যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি এই অভিঘাতে বিপর্যস্ত নিম্নবর্গ মানুষের জীবন-

যন্ত্রণার রূপায়ণেও রেখেছেন দক্ষতার স্বাক্ষর। বাংলাদেশের নিম্নবর্গীয় মানুষের অস্তিত্বসংকট ও তাদের অস্তিত্ব-অভীপ্সাই হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়।

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে যেসব শিল্পি-সাহিত্যিক নিম্নবর্গের জীবন ও জীবনসংকটকে উপজীব্য করে গল্পশিল্পে অসামান্যতা সম্পাদন করেছেন তাঁদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক ছিলেন অগ্রণী। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা নয়: *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* (১৯৬৪), *আত্মজা ও করবী গাছ* (১৯৬৭), *জীবন ঘষে আগুন* (১৯৭৩), *নামহীন গোত্রহীন* (১৩৮২), *পাতালে হাসপাতালে* (১৯৮১), *আমরা অপেক্ষা করছি* (১৯৮৯), *রোদে যাবো* (১৯৯৫), *মা-মেয়ের সংসার* (১৯৯৭) *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* (২০০৭)। এগুলোর মধ্যে *সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য* এবং *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* প্রাক্-মুক্তিযুদ্ধ পর্বে প্রকাশিত হলেও তাঁর অবশিষ্ট গল্পগ্রন্থের গল্পসমূহ স্বাধীনতা-উত্তরকালে রচিত ও প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তাঁর রচিত গল্পসমূহে বর্ণিত নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণের স্বরূপ-অনুসন্ধান আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

জীবন ঘষে আগুন

হাসান আজিজুল হকের 'শোণিত সেতু' গল্পটি নিম্নবর্গীয় কৃষিজীবী জনপদের সামাজিক ঐক্য ও সংগ্রামশীলতায় বিশিষ্ট। গ্রামজীবনে শোষণ-বঞ্চনা ও অবিচারের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রামী শিল্পকথা গল্পটির মৌল উপজীব্য। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিণত পর্বে রচিত এ-গল্পে গ্রামবাসীর আত্মরূপান্তরের সমান্তরালে পূর্ববাংলার জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও রূপান্বিত করেছেন গল্পকার। কর্তৃত্ববাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে ধ্বনিত হয়েছে বাঙালি জাতিসত্তার সংগ্রামী চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। গল্পের স্থানিক পটভূমি হিসেবে গৃহীত হয়েছে তৎকালীন পূর্ববাংলার দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি গ্রামীণ জনপদ। তিনটি কাহিনির সমবিস্তারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে গল্পের গতি। মানিক ও অবলাকান্ত-নামী দুটি ষাঁড়ের লড়াইসূত্রে গল্পটির সূচনা হলেও হাঁপানি রোগাক্রান্ত গ্রামীণ কবিরাজ নিশানাথের মরণাপন্ন অবস্থা ও তাকে ঘিরে উৎসুক জনতার ভিড় গল্পটিতে যুক্ত করেছে ভিন্ন মাত্রা। এক পর্যায়ে বিদেশি অবলাকান্তের সঙ্গে 'ধর্মের ষাঁড়' মানিকের প্রাণান্তকর লড়াই গ্রামবাসীকে আকৃষ্ট করে প্রবলভাবে। তারাও মানিকের পক্ষাবলম্বন করে। মানিকের জয়-পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তাদের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন। আর তৎক্ষণাৎ খবর আসে তাদের বিলের ধান কেটে নিতে চায় এক শহুরে ব্যবসায়ী। এমন আকস্মিক সংবাদে আলোড়িত হয় সমগ্র জনগোষ্ঠী। কৃষকনেতার

প্রতিবাদী নেতৃত্বে তারা প্রস্তুত হয় নিজেদের ফসলের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিকল্পে। এ-পর্যায়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে জয়যুক্ত হয়ে উঠে বসে কবিরাজ নিশানাথ। অন্যদিকে গ্রামের ষাঁড় মানিকও বিদেশি অবলাকান্তের ওপর পরাক্রম প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। আর এসকল সংবাদে গ্রামবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রতিরোধের সংগ্রামী স্পৃহা। জাগরণের মন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শোষিত ও নির্যাতিত সাধারণ মানুষ।

‘শোণিত সেতু’ গল্পটিতে ‘তিনটি সংগ্রামের পরিপূর্ণ ও নিটোল চিত্রের মধ্যে কোথাও পরাভবের দৈন্য নেই – আশ্চর্য অমেয় প্রাণশক্তির প্রাচুর্য তাদেরকে শেষপর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয়ী করে তুলেছে।’ (জাফর, ১৯৯৬: ৫৭) গল্পটিতে উন্মোচিত হয়েছে ফসলের অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে অধিকারপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। গ্রামজীবনে নিম্নবর্গ মানুষের সমবেত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা শহুরে ব্যবসায়ীর অপতৎপরতা নির্মূলে পালন করেছে সোচ্চার ভূমিকা। ‘ধর্মের ষাঁড়’ মানিকের জয়যাত্রা ও নিশানাথের নবজীবনপ্রাপ্তি কেবল বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই উপস্থাপিত হয়নি বরং অস্তিত্বরক্ষার এ লড়াইয়ে চিহ্নিত হয়েছে মানবীয় জীবনাদর্শের পথনির্দেশ। বহিঃশত্রুর অযাচিত ও অনভিপ্রেত আক্রমণে গ্রামের ‘লক্ষ্মী’ ষাঁড়কেও নামতে হয় আত্মরক্ষার অনিবার্য সংগ্রামে। গ্রামীণ যূথবদ্ধ মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় উপভোগের বিষয় হিসেবে ষাঁড়ের লড়াই প্রত্যক্ষ করলেও বহিরাগত ও বর্বর অবলাকান্তের অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে মানিকের সুদৃঢ় প্রতিরোধ অবচেতনেই তাদের মধ্যে যোজিত করে সংগ্রামী ঐক্যসূত্র। গ্রামবাসী যেমন মানিকের পক্ষে একাত্ম হয় তেমনি মানিকের লড়াই প্রমাণ করে – প্রতিরোধই মুক্তির একমাত্র পথ। ‘জীবন মানে লড়াই; এই লড়াই অস্তিত্বের জন্য, মর্যাদা ও মুক্তির জন্য।’ (চন্দন, ২০১৮: ২৩৮) মানিকের লড়াইয়ের সমান্তরালে নিশানাথের মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের লড়াই যুক্ত করেছেন গল্পকার। অভাবের সংসারে দিশেহারা ছয় সন্তানের পিতা নিশানাথ। তিনি পেশায় কবিরাজ; হাঁপানি রোগে ভুগছেন বিশ বছর ধরে। কিন্তু নিজের কিংবা মায়ের অসুখে নিজের কোনো ঔষধ তিনি প্রয়োগ করেননি। উপরন্তু এই কবিরাজি পেশায় তাঁর অভাব-অনটনের যে কিছুটা লাঘব হয়েছে এমন তথ্যও গল্পটিতে নেই। বিভাগ-পরবর্তী কালে সহোদরভ্রাতা দেশত্যাগ করলেও নিশানাথ এদেশেই থেকে যান। নিম্নবর্গ নিশানাথের দৈন্যদশাগ্রস্ত জীবনকে লেখক উপস্থাপন করেছেন সকৌতুক ভঙ্গিমায়:

> পাশের গাঁয়ের পাশ করা ডাক্তার নিশানাথের মরার তদারক করতে এলো। সে একটা চ্যাটাইয়ে শুয়েছিল একটা চ্যাটাই মাত্র, কাঁথা তার কোনকালে ছিল না একথা সত্যি নয়, সেটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে এমনভাবে যে সেটাকে আর কিছুতেই ব্যবহার করা যায় নি। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৭৭)

গল্পকার নিশানাথের পরিবারের দুর্গতির চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি এই জনপদের অন্যদের জীবনও যে খুব সুখ-সচ্ছল নয় সেই কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন- ‘মেটে আলু

অবশ্যি এখন সবাই ভাতের বদলেই খাচ্ছে। তা নাহলে ওতো কচু ঘেঁচুর মতোই বাঁদর আর শুয়োরের খাবার।' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৭৯) নিশানাথের মতো গ্রামের উদ্‌বিগ্ন কৃষক মালেক মোড়ল, ভূমিহীন ভাগচাষি রমাজান শেখ, আলুচাষি দারোগালি, গ্রামীণ হাতুড়ে বরকত, সাত্তার মোড়ল, খাদেম, খালেক, পরশ কিংবা এলাকার চিহ্নিত চোর হানিফ সকলেই নিম্নবর্গের অন্তর্গত। নিশানাথের বাড়িতে প্রতিবেশীদের অবস্থানকালেই মানিক-অবলাকান্তের লড়াইয়ের খবর এলে গ্রামবাসীরা 'তাদের ষাঁড় মানিকের পক্ষে চলে যায় সবাই। গাঁয়ের ইজ্জতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে ব্যাপারটা'। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৮০) নিশানাথের মৃত্যুর বিষয়টিও তখন তাদের কাছে 'পানসে' হয়ে আসে। দুটি ষাঁড়ের লড়াইয়ে গ্রামবাসী খুঁজে পায় তাদের প্রাত্যহিক সংগ্রামী জীবনের যোগসূত্র:

> অসংখ্য কাজে গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ সব সময়ই মৌমাছির মতো ব্যস্ত। যারা দিনমজুর খাটে তাদের তো কথাই নেই—ভোরে বেরিয়ে যেতে হয়। মোটকথা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামটা হয়তো চোখে দেখতে পাওয়া যায় না সব সময়ে কিন্তু চলছে তো প্রতি মুহূর্তেই। কখনো তীব্র হয়ে ওঠে, কখনো বা নিশানাথের সংসারের মতো ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলে। ... তাদের সকলের মধ্যেই তো লড়াইটা এলিয়ে ছড়িয়ে আছে! (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৮৭)

কিন্তু শহুরে ব্যবসায়ী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গ্রামের কৃষকদের ধান কেটে নেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে- এই খবরে পুরুষানুক্রমিক শোষিত এই নিম্নবর্গের মানুষগুলো অভিন্ন লক্ষ্যে সমবেত হয়। প্রথমাবস্থায় অস্তিত্বগ্রাসী এই দুঃসংবাদ তাদের মধ্যে হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দিলেও মানিকের অবিশ্রাম লড়াইয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রতিরোধের নবস্পৃহা। অদৃষ্ট বা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের পরিবর্তে 'যে ধান কাটতে আসবে তার গলাড়া কুপয়ে ধড়ের থে নামায়ে ফেলতি হবে' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮ : ১৮৬)—এমন প্রতিজ্ঞায় তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের কথা ও কাজে ক্রমশ প্রকাশ পায় নবপ্রাণের স্পন্দন:

> এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার যে কিভাবে একটি পুরো গ্রাম জেগে যেতে পারে। খুবই ধীরে ধীরে প্রায় অলক্ষ্যে- এমনকি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তার আদানপ্রদানটা পর্যন্ত সীমিত করে দিয়ে সমস্বার্থের মানুষ কাঁধে কাঁধ দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারে। অথচ কাজটা যে অত্যন্ত জটিল তা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে। বিপজ্জনক যে সেটা তো প্রশ্নের বাইরে। তা মনেই আসে না কারো। জীবন যেতে পারে নয় শুধু, জীবন যাবেই দুচারটে এটা নিশ্চিত জেনেও কাজটা অবশ্য করণীয় বলেই মানে তারা, বিপজ্জনক হিসেবে নয়। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৯২)

এ-পর্যায়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তারা প্রতিরক্ষা ও ফসলসংগ্রহের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। অতি অল্প সময়ে সকলেই একই প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ হয়। সমস্ত গ্রামটি যখন 'উত্তেজনার অগ্নিকুণ্ডে' রূপান্তরিত হয় তখন অজেয় প্রাণশক্তির স্পর্শে অবিনাশী মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসে নিশানাথ। এ-পর্যায়ে দেখা যায় রাজকীয় বিশাল শরীর নিয়ে

প্রবল গর্জনে অবলাকান্তকে তাড়া করছে মানিক। নিশানাথ ও মানিকের যুগপৎ বিজয় অর্জিত হলে গ্রামবাসীরাও 'একসঙ্গে গভীর খাদ থেকে চিৎকার শুরু করে তীব্রতার শেষপ্রান্তে গিয়ে থামে।' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ১৯৪) সমবেত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এভাবেই গল্পটিতে অর্জন করে নবতর জীবনের আলোকোড্ডাস। ভূমিলগ্ন নিম্নবর্গ মানুষের ভূমি ও ফসলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গল্পকার এ-গল্পে মানবমুক্তির চিরায়ত পথেরই যেন সন্ধান করেছেন।

'জীবন ঘষে আগুন' গল্পে হাসান আজিজুল হক সামন্ত ভূস্বামীদের শোষণ-বঞ্চনা-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন। বিশদায়তন এ-গল্পের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে রাঢ়বঙ্গের সৃজনসম্ভাবনাহীন প্রতিবেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তেঁতুলে বাগদিদের সংগ্রামী জীবনের চালচিত্র। বৈশাখ-সংক্রান্তিতে হলকর্ষণের মহোৎসব ও মেলাকে কেন্দ্র করে এ-গল্পের ঘটনাংশ বলয়িত হলেও ভূমিহীন অন্ত্যজ তেঁতুলে বাগদিদের প্রতিবাদী চেতনার রূপ-রূপান্তরই গল্পটির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ। আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিচারে নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী স্থানীয় জমিদার-জোতদার ও ভূস্বামীদের শোষণ-শৃঙ্খলে বৃত্তবদ্ধ হয়ে পড়লে তেঁতুলে বাগদিদের মধ্যে উপ্ত হয় বিদ্রোহের বীজ। পুরোহিতের শোষণবাণীর বিরুদ্ধে তারা যেমন উচ্চকণ্ঠ হয়, তেমনি তাদের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সুযোগে ভূস্বামীদের অসংযত যৌনাচারের বিরুদ্ধেও উচ্চকিত হয় তাদের মানবীয় প্রতিবাদ।

শেষ বৈশাখে আশ্রয়হীন রুক্ষ-উষর ভূমিতে মহাকায় হাতির পিঠে পেটমোটা বাবুদের আগমনে এ অঞ্চলের ক্ষুধার্ত একদঙ্গল বালক তাদের পিছু নেয়। উৎসব-বর্ণিল মেলার আয়োজন ক্ষুধার্ত জনপদে কোনো প্রশান্তির বার্তা নিয়ে আসে না। ক্ষণিকের উৎসবে তাদের প্রজন্ম-পরম্পরায় শোষিত হওয়ার স্মৃতিও ম্লান হবার নয়। জমিদার ও জোতদারশ্রেণি ভূমি ও ফসলের মালিক। ফলে এই মেলা ও পূজার সর্বজনীনতা ভূমিলগ্ন মানুষের নিকট হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। ধর্ম ও পুরোহিত যে শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার এবং সমাজপ্রভুদের ক্ষমতাপ্রয়োগের ভিন্নতর মাধ্যম এ সত্য যখন তেঁতুলে বাগদিরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, তখন মায়ের আশীর্বাদে পুরোহিতের সুজলা-সুফলা বঙ্গভূমিতে আদ্যন্ত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মিথ্যা বিবৃতি তাদের কাছে ভীষণভাবে ধিকৃত হয়। ফলে 'ঠাকুরমোশাইকে উল্টিয়ে দে, উয়াকে চিৎ করে দাও গো, কাছিমটোকে চিৎ করে দাও হে' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২১৩) প্রভৃতি বাক্যাবলি উচ্চারিত হয় তাদের কণ্ঠে। ধর্মবাণীর মোহিনীশক্তিতে নিম্নবর্গ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী যে শোষণশৃঙ্খলে বৃত্তবদ্ধ হয়ে পড়েছে তা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়। সঙ্গত কারণেই হলকর্ষণে যোগদানের পরিবর্তে শোনা যায় তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর:

> ই মাটি কার? ই কি মোদের? বলো গঁ-লিব্বাক হবে না খবরদার। কোন্ মাঠে যাবো মোরা? মুখে গামছা জড়ানো দল মনে মনে ভাবে, এই মাটি তুমাদের। আমাদেরও বটে। তবে উয়ার ভ্যাতরে যাবার লেগে। কবর-লাগ হবার লেগে। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২১২)

অস্তিত্ববিনাশী দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তাড়নায় অন্ত্যজ তেঁতুলে বাগদি নারীরা আধাবাবুদের যৌনলালসার শিকার হয়। বিধবা পিঙ্গলা ও কালি সামান্য অর্থের বিনিময়ে ঘণ্টাবাবুর নিকট দেহদানে বাধ্য হয়। অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত স্বামীকে খাবার প্রদান সমাপ্ত হলে একটি মাত্র ছেঁড়া চটের পর্দার আড়ালে কালিকে অধিকার করে ঘণ্টাবাবু। অন্নহীন পোড়ার দেশে যেখানে 'ভদ্রলোকেরা ভাত ছিটিয়ে' নিম্নবর্গ নারীদের বস্ত্রহরণ করে সেখানে 'চিমসে দুর্গন্ধ বদ মরণ মরার চেয়ে একটি উজ্জ্বল হত্যাকাণ্ডের প্রতিরোধ' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২৩০) হয়ে পড়ে অনিবার্য। ফলে কালির ঘরে অবস্থানকালেই অভিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর ও অন্যদের সমবেত আক্রমণে 'শুকরজাত' ঘণ্টাবাবুর মৃত্যু নিশ্চিত হয়। কিন্তু পরদিন জমজমাট মেলাপ্রাঙ্গণে পশুবলির প্রাক্কালে কর্তৃত্ববাদী বাবুরা বাগদি পাড়ায় প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্বলিত করলে তেঁতুলে বাগদিরাও ঘোষণা করে দ্রোহ ও সংগ্রামের সর্বাত্মক লড়াই। কেননা দীর্ঘদিনের শোষণ-পেষণে বিপর্যস্ত 'এই বিশাল ভূখণ্ড ভয়ঙ্কর দাহ্য ছিল' (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২৪১)। সর্বপ্রকার 'জুলুমের' অবসানকল্পে মনোহর-মন্তাজের নেতৃত্বে তেঁতুলে বাগদিদের ঐক্যবদ্ধ জাগরণ সম্ভব হয়। এভাবেই নিম্নবর্গ মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার ইঙ্গিতময় পরিসমাপ্তি ঘটেছে এ-গল্পে।

নামহীন গোত্রহীন

মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ পটভূমিকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ হাসান আজিজুল হকের 'ভূষণের একদিন' গল্পের উপজীব্য বিষয়। দরিদ্র কৃষক ভূষণ দাসের জীবনবাস্তবতার আলোকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়পটে এদেশের নিম্নবর্গ মানুষের নির্মম পরিণতির চিত্রাঙ্কনে হাসান আজিজুল হকের কৃতিত্ব অসামান্য। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ভূষণ দাস পেশায় কৃষক। জীবন-জীবিকা হিসেবে কৃষিকে অবলম্বন করলেও চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমি তার নেই। বাড়ি এবং বাড়ি-সংলগ্ন দশকাঠা জমিই তার সহায়। বর্গাচাষের মাধ্যমে যে সামান্য ধান সে পায় পূর্ববর্তী বছরের ঋণপরিশোধস্বরূপ তার সবটাই তুলে দিতে হয় মালিকের হাতে। ফলে দারিদ্র্য, অনাহার আর উপবাসই তার পরিবারের নিত্যসঙ্গী। ভূষণের জীবনযাপনের রীতি-পদ্ধতিতে এদেশের নিম্নবর্গ কৃষিজীবী মানুষের জীবনসত্যই প্রতিভাত হয়। মাঠে ফসলের প্রাচুর্য থাকলেও তাতে অধিকার নেই ভূষণের। বর্গাচাষি ভূষণের শ্রমলব্ধ ফসলের পুরোটাই গ্রাস করে মালিক-মহাজনরূপী শোষকশ্রেণি। এমতাবস্থায় তার দুর্দশা হয়ে ওঠে সীমাহীন। গল্পকার ভূষণের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের ক্ষোভ ও বঞ্চনার বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন এভাবে:

> মেজাজ খারাপ হবার অনেকগুলো কারণ রয়েছে অবশ্য। এখনো বিলের মাঠে ধানের নাড়া রয়েছে। যতদূর চোখ যাচ্ছে জড়াজড়ি করে রয়েছে, ধান খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে পাখিগুলো। অথচ তার বাড়িতে একমুঠো ধান নেই। গত বর্ষায় মালিকের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ধানে শোধ দিতে গিয়ে ভাগে পাওয়া ধানটা সব শেষ হয়ে গিয়েছে। গরু দুটোকে খেতে দেবার জন্যে একমুঠো খড় পর্যন্ত নেই। ধুঁকছে গরু দুটো। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২৪৪)

নিয়তির বিরুদ্ধে সদা যুদ্ধরত এই ভূষণের জীবন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শালতি বেয়ে সামান্য সবজি বিক্রির জন্য হাটে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্বিচার বোমা ও গুলিবর্ষণে প্রাণ হারায় ভূষণ এবং তার পুত্র হরিদাস। একথা সত্য যে, গল্পটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিপরীতে বাঙালির প্রতিরোধ-সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু ভূষণ ও হরিদাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাজের নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় তাদের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়াবলম্বনে রচিত ছোটগল্প ‘ঘরগেরস্থি’। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়পটে সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনে এদেশের অগণিত মানুষ হয়েছিল বাস্তুহারা। ইতিহাসের এমন বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে হাসান আজিজুল হকের ‘ঘরগেরস্থি’ গল্পে।

এ-গল্পে সাম্প্রদায়িক শক্তির উৎপীড়নে স্বভূমি ও স্বদেশ-উন্মূল রামশরণের দরিদ্র পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে আশ্রয় নেয় পার্শ্ববর্তী ভারতভূমিতে। সামান্য ভিটেজমি ও একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল রামশরণের সম্বল। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে প্রকাশ্য দিবালোকে প্রতিবেশী রশিদ তার গাভীটি লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। সর্বস্বরিক্ত রামশরণ প্রাণরক্ষায় সপরিবারে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হয়। এ-গল্পের রামশরণ ও ভানুমতি কেবল নিম্নবর্গ নয়, একই সঙ্গে তারা উদ্বাস্তু এবং সর্বস্বান্ত। পরাধীন দেশে তাদের মাথাগোঁজার যে সামান্যতম ঠাঁই ছিল, সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসন ও পাকিস্তানি সৈন্যদের ধ্বংসলীলায় সেই আশ্রয়স্থল থেকেও তারা বঞ্চিত। রামশরণ ও ভানুমতির জীবনে ‘স্বাধীনতা’-শব্দটি হয়ে ওঠে নির্মম ও পরিহাসমূলক। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ তাদের জন্যে সৌভাগ্যের কোনো বার্তা বহন করে আনেনি; বরং যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে তাদের জীবনে যে দুর্ভাগ্যময় ঝড়ের সূচনা হয়েছিল, যুদ্ধোত্তরকালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। স্বাধীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত রামশরণের উচ্চারণে তাই খোদ ‘স্বাধীনতা' শব্দটিই হয়ে উঠেছে প্রশ্নবিদ্ধ:

> স্বাধীন হইছি তাতে আমারবাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডিয়ে-নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ এই ইস্টিশান, কাল জাহাজঘাট-রামশরণের কথা থেকে ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দে ধার ছিটকোতে থাকে, স্বাধীনতাটা কি, অ্যাঁ? আমি খাতি পালাম না-ছোয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনতা

> কোঁয়ানে? রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো-ভিক্ষে করো লোকেরবাড়ি বাড়ি ..... আমি বলতিছি কি-স্বাধীন হইছি না কি হইছি বোঝবো কেমন করে? আগে এটা ভিটে ছিলো, এখন তাও নেই। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ৩০৮-৩০৯)

ভাগ্যবিড়ম্বিত রামশরণের পরিবার যুদ্ধোত্তরকালে নবস্বপ্নে জীবনগড়ার প্রত্যয় নিয়ে শরণার্থী জীবনের দুঃস্বপ্ন ভুলে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও তাদের জন্য পোড়ামাটির বসতভিটা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নিম্নবর্গ মানুষের জীবনে স্বাধীনতার স্বপ্ন ওবাস্তব-প্রাপ্তির মধ্যে যেবিস্তর ব্যবধান তা-ই মূলত উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে। যুদ্ধের সর্বগ্রাসী রূপ কেবল রামশরণকে নয় তার সমগ্র পরিবারটিকেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কীভাবে কাতর করেছে, তা গল্পটিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

'কেউ আসেনি' গল্প মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে দুজন মুক্তিযোদ্ধার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পটভূমিকায় নির্মিত। মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ও ব্যর্থতাকে এ-গল্পে বাস্তবতার কষ্টিপাথরে বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন হাসান আজিজুল হক। যে কাঙ্ক্ষিত স্বর্ণস্বদেশ বিনির্মাণের প্রত্যাশায় এদেশের নিম্নবর্গের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাদের সেই প্রত্যাশা ও স্বপ্নসাধের ঘটেছিল নির্মম পরাভব। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী বিপ্লবে যাদের অবদান ছিল অতুলনীয় স্বাধীন দেশে তারাই ক্রমশ অনিশ্চয়তার অতল অন্ধকারে হয়েছে নিমজ্জিত। রণাঙ্গনের বিজয়ী বীর সৈনিকের স্বাধীন দেশে হয়নি জীবিকা ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা। 'স্বাধীনতার তিক্ততম' অভিজ্ঞতা মুক্তিকামী এসকল মানুষের মানসপটে এঁকে দিয়েছিল বেদনার স্থায়ী ক্ষতচিহ্ন। এ-গল্পের ঘটনাংশ সামান্যই। মুক্তিযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে আহত-নিহত অনেকের সঙ্গে হাসপাতালের ভ্যানে স্বদেশে ফিরে আসে গফুর। যুদ্ধক্লান্ত গফুর নিজগ্রাম সয়রাবাতে ফিরতে উদগ্রীব হলে ভ্যানে থাকা একই গ্রামের যুদ্ধাহত আসফকে দেখতে পায়। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার গফুরকে জানায় আসফের গুলিবিদ্ধ পায়ে পচন ধরেছে, পা কেটে না ফেললে তাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না। হাসপাতালের বিছানায় স্বল্পপরিচিত গফুরের নিকট আসফ ব্যক্ত করে স্বাধীন দেশে তার প্রত্যাশিত স্বপ্নময় জীবনের কথকতা। মায়ের পছন্দে জেন্নাত-নাম্নী এক তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। প্রত্যাশা ছিল যুদ্ধশেষে তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে প্রবেশ করবে সংসারজীবনে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে একটিমাত্র গুলির আঘাতে আসফের সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ক্ষতাক্ত পা কেটে ফেলার একপর্যায়ে তার অসুস্থতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়, এবং একপর্যায়ে সে মৃত্যুবরণ করে। আসফের মৃত্যু হলে 'কর্তব্যমুক্তির আস্বাদ' নিয়ে নদী তীরবর্তী পথ ধরে গফুর যাত্রা করে গ্রামের উদ্দেশে।

ক্ষুধা-দারিদ্র্য আর অভাব-অনটনের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামশীল নিম্নবর্গের মানুষ তাদের জীবন-জীবিকায় স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সুফল প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাদের সে-স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এ-প্রসঙ্গে গফুরের আত্মভাবনা লক্ষণীয়:

> যুদ্ধের ঝামেলায় ধানা কাটা ঠিকমতো শুরু হয়নি। এখন যুদ্ধ শেষ। গফুর বুঝতে পারছে না ধান কাটা বলতে সে নিজেকে কি বোঝায়। তার নিজের তো কোনো জমি নেই। যুদ্ধের আগে সে কামলা খাটত। এখন সে বাড়ি গিয়ে কি করবে। দেশ তো স্বাধীন হয়ে গেল! এখন ধান কাটা শুরুর মানে কি? সে কি আবার গিয়ে কামলা খাটবে রাইফেল থাকি-টাকি ফেরৎ দিয়ে? না কি অন্য ব্যবস্থা কিছু হবে? (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ২৮৭)

গফুর জানে না কোথায় তার জীবনের গন্তব্য। মানসলোকে যে দুঃসহ জীবনস্মৃতি সে বহন করে চলেছে তা তাকে দেয় না কোনো স্বস্তির সন্ধান। সয়রাবতের নদীতে মাছশিকারের সুখস্মৃতি ব্যতীত সবই তার কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হয়। তবু সে আগামী দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়। তার এই প্রত্যাশিত জীবননির্মাণের মূলে আছে গল্পকারের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক সদর্থক জীবনভাবনার অঙ্গীকার।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যুদ্ধফেরত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে 'ফেরা' গল্পের পটভূমিকায়। যুদ্ধাহত আলেফের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের দর্পণে গল্পকার যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে হতাশায় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত সময়ের অভিজ্ঞতাপুঞ্জকে রূপদানের পাশাপাশি নিম্নবর্গ মানুষের অস্তিত্বসংগ্রামের সদর্থক প্রান্তসমূহকেও উন্মোচন করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আলেফ আহত হলেও সহযোদ্ধা আমিনের গুলিবিদ্ধ পা অপারেশনের মাধ্যমে কেটে ফেলার পর তার মৃত্যু হয়। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘসময়ব্যাপী আলেফ তার পরিবার থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর আলেফ লক্ষ করে, তার স্ত্রী পিত্রালয় থেকে তার কাছে ফিরে এসেছে, যে কিনা যুদ্ধের পূর্বে খাবারের অভাবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পালিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনদেশে অন্নকষ্টের বিমোচন হবে এমন প্রত্যাশায় ফিরে আসে তার স্ত্রী। আলেফের মায়ের প্রত্যাশা সরকার অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তার ছেলেকেও পুরস্কৃত করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধারা একদিকে কর্মহীন, অন্যদিকে অবহেলার শিকার। বেনপুরে আমিনের মৃত্যুসংবাদ দিতে গিয়ে আলেফ জানতে পারে সরকারের পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র জমাদানের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু আলেফ বাড়ি ফিরে অস্ত্র জমা না দিয়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী ডোবায় ফেলে দেয়, যাতে প্রয়োজন হলে পরবর্তীকালে সহজেই সেটি খুঁজে পাওয়া যায়। মুক্তিযোদ্ধা আলেফের কর্মকাণ্ডে এই সত্যই অভিব্যক্ত হয় যে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। বিদেশি শাসকশক্তির বিরুদ্ধে জয় নিশ্চিত হলেও অর্থনৈতিক মুক্তি, সামাজিক সাম্য ও স্থিতির প্রয়োজনে আলেফের মতো মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ এখনো চলমান। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক মহীবুল আজিজের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> মুক্তিযোদ্ধা আলেফ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ নয়, সে ক্ষুব্ধ সমাজে নতুন জন্ম নেয়া শোষক শ্রেণীটির ওপর। আলেফের যুদ্ধ তাই শেষ হয়েও শেষ হয় নি, এ-যুদ্ধ তার ভবিষ্যতের বৃহত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশের অভিষেক। (মহীবুল আজিজ ২০১৮: ৯০)

একাত্তরের ভয়াবহ যুদ্ধের পর এদেশের মানুষ, বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষের প্রত্যাশা ছিল স্বাধীনতা তাদের জন্যে আনন্দ-উজ্জ্বল জীবনের আস্বাদ নিয়ে আসবে-ক্ষুধা, দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু স্বাধীনদেশে কর্মহীন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রহাতে ঘুরে বেড়াতে দেখে আলেফ বুঝতে পারে, মুক্তিযোদ্ধাদের অকল্পনীয় ত্যাগ ও তিতিক্ষা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে হৃদয়ে রক্তাক্ত হাহাকার নিয়ে নির্দ্বিধায় আলেফ স্ত্রীকে জানাতে পারে 'এখানে থাকলি খাতি পাবি ভাবিস? হয়তো খাতি পাবি না'। (হাসান, ১ম খণ্ড, ২০১৮: ৩০০) যে তিমিরসম অভাব-অনটন আর অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ ঘটেছিল আলেফের, যুদ্ধোত্তরকালেও তার অবসান ঘটেনি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজগতির এই উল্টোস্রোত ও বহুধা অসঙ্গতিকে গল্পকার এ-গল্পে ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

পাতালে হাসপাতালে

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দুর্ভিক্ষকবলিত বাংলাদেশের গৃহহীন উদ্বাস্তু মানুষের অশেষ যন্ত্রণার চিত্র 'মধ্যরাতের কাব্যি'-গল্পের বিষয়াংশে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত-পরবর্তী সময়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অচলাবস্থায় জাতীয় জীবনে নেমে আসা দুর্ভিক্ষের কারণে নিম্নবর্গ মানুষের বিপর্যস্ত অবস্থা ও তাদের অস্তিত্বসংগ্রাম বস্তুনিষ্ঠ অবলোকনের বিষয়ে পরিণত করেছেন গল্পকার। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবনকাঠামোয় গুণগত পরিবর্তনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল এ-পর্যায়ে তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। দুমুঠো খাবারের আশায় মানুষ গ্রামত্যাগী হয়ে শহরমুখী হয়। এ-গল্পের দরিদ্র বুড়ি ও তার নাতনি অস্তিত্বরক্ষার শেষচেষ্টা হিসেবে শহরে আসতে বাধ্য হয়। নিরন্ন এই বৃদ্ধা ও তার নাতনির জীবনবাস্তবতার চিত্র উন্মোচন করে গল্পকার জানিয়েছেন:

> দুদিন আগে একটা ট্রেনে চেপে তারা এখানে পৌঁছেছে। সঙ্গে গাঁয়ের অনেক লোক ছিল, অগুনতি মেয়ে পুরুষ। নাতনি ভেবেছিল দাদি তার পথেই মরবে, ঢাকা আর পৌঁছুতে পারবে না। গত চার-পাঁচ দিনে পটাপট তার চোখের সামনেই মরে গিয়েছিল তিন-চারটে বাচ্চা আর গোটা দুই বুড়ো। কিন্তু হাড়ের জোর আছে বুড়ির, একনাগাড়ে কদিন উপোস দিয়েও ঠিক পৌঁছে গেল। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮ : ৪০)

রেলস্টেশনের আলোকোজ্জ্বল পরিবেশেও জীবনের দুর্বিষহ স্মৃতি তারা বহন করে চলে। বৃদ্ধা তিনদিন অনাহারে থেকে তার একমাত্র ছেলেকে কাজে পাঠালে তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার পুত্রের মতো গ্রামের অসংখ্য মানুষ এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গল্পশেষে অসুস্থ ও হতবল বৃদ্ধা মাটিতে লুটিয়ে পড়লে নাতনির ওপর নেমে আসে বুট পরিহিত লোকটির পাশবিক নির্যাতন। প্রাসঙ্গিক বর্ণনাংশ লক্ষণীয়:

> নাতনির ফেঁপে ওঠা পলকা শরীর। তার ওপর হাত রাখতেই কণ্ঠার হাড়টি মুট করে ভেঙে যায়। সেইটিকে বেশ করে চুষে চুষে খাওয়া হলো। স্তনের মাংস এর মধ্যেই

> ছিবড়ে হয়ে গেছে। তার চেয়ে পাঁজরের হাড়গুলো নরম-কচকচ করে খাওয়া চলে কাছিমের হাড়ের মতো। অবশ্য একছিটে চর্বি নেই। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ৪৪)

স্বাধীনতা বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম ঘটনা সন্দেহ নেই; কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্রের কারণে মানুষ স্বাধীনতার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়; দেশজুড়ে নেমে আসে মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ; নিম্ন আয়ের মানুষ নিপতিত হয় চরম দুর্ভোগে। একাত্তরে একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশ অর্জিত হলেও ক্ষুধা দারিদ্র্য ও শোষণ থেকে দেশের মানুষের মুক্তি অর্জিত হয়নি। ফলে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর মৃত্যুই হয়ে উঠেছে এদেশের জনজীবনের নির্ধারিত নিয়তি। ইতিহাসের এই ভয়ানক সময়খণ্ডে নিম্নবর্গ মানুষের জীবনবাস্তবতার বস্তুনিষ্ঠ উপস্থাপনায় 'মধ্যরাতের কাব্যি'-গল্পটি অর্জন করেছে অসামান্য সাফল্য। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নারীসমাজের অস্তিত্বসংগ্রাম ও প্রতিকারহীন জীবনবাস্তবতার চিত্র রূপাঙ্কিত হয়েছে হাসান আজিজুল হকের 'সরল হিংসা' গল্পে। একইসঙ্গে গল্পটিতে উন্মোচিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলাদেশে নারীজীবনের দুঃসহ বাস্তবতা ও তার বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদ। সদ্যঃস্বাধীন দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের দুঃসহ পীড়নে বিপন্ন হয়েছে গার্হস্থ্যধর্ম ও সংসারজীবন। অনেক নারী হারিয়েছে তাদের স্বামী-সন্তান। দুর্ভিক্ষের পদপাতে বিপর্যস্ত এই নারীরা অস্তিত্বতাড়নায় ধাবিত হয়েছে নগর অভিমুখে। নগরজীবনে ডাস্টবিন আর নর্দমার নোংরা আবর্জনায় তারা ক্ষুন্নিবৃত্তির সন্ধান করেছে। নিজের ও পরিবারের বেঁচে থাকার এ-লড়াইয়ে কেউবা অবলম্বন করেছে পতিতাবৃত্তি। এ-গল্পের জয়তুন, তসিরুন, টেপি, গোলাপি, পুষ্প সকলেই প্রাণরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে পতিতাবৃত্তিকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু গল্পের উপান্তে লক্ষ করি সমাজশক্তির বিরুদ্ধে এই জীবনবঞ্চিত নিম্নবর্গ নারীদের ক্ষোভের প্রকাশ। গল্পকারের বর্ণনায় :

> বামন মানুষটিকে হাতে হাতে লোফালুফি করে জয়তুন, ঢেঁপি, তসিরুন আর গোলাপির দল। পুষ্প তার ঘাড়ের কাছে নখ ডুবিয়ে ধরে, কথা নেই মুখে তর, মুখে কুট নাকি, ও বাবু? প্রচণ্ড ধাক্কা দেয় সে। ছিটকে পড়ে বামন। প্রায় সাথে সাথেই তসিরুন গুঁজে ধরে তার ঘাড়, নষ্ট করার মতো একটি মুহূর্তও তার হাতে নেই। কোনো কথা সে বলে না, তার পিঠের উপর চেপে বসে প্রাণপণে হাত চালিয়ে যায়। শেষে তসিরুনকে টেনে সরিয়ে জয়তুন বলে, মিনসে কি তোরে একা পছন্দ করিছে? সরে আয় কচ্ছি। সবাই মিলে চিত করে শুইয়ে দেয় লোকটাকে। বামন সব চেষ্টা ছেড়ে দেয় ... সাদা চোখ দুটিতে তার কি এক ভয়ঙ্কর কষ্ট। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ৫০-৫১)

যে-সমাজ তাদের দুমুঠো খাবারের নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, সে-সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তাদের জন্য হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। যদিও এই প্রতিবাদ তাদের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনে সুখের আস্বাদ নিয়ে আসেনি, তবু এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধই যে তাদের দিতে পারে মুক্তির পথনির্দেশ সেই সত্য গল্পটিতে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে একটি হাসপাতালের চিকিৎসাব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসক-কর্মচারীদের অবহেলায় সমাজের নিম্নবর্গ মানুষ কীভাবের চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে-সত্যই উন্মোচিত হয়েছে হাসান আজিজুল হকের 'পাতালে-হাসপাতালে'-গল্পে। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যঃস্বাধীন রাষ্ট্রে কর্তৃত্ববাদী সামরিক শাসনে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার মতো জরুরি বিষয়গুলোও উপেক্ষিত হয়ে পড়লে নিম্নবর্গীয় মানুষের ওপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। কারণ এসকল নিম্নবর্গীয় মানুষ কেবল সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থার ওপরই নির্ভরশীল। এই বিরাট বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে কীভাবে চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত রাখা হয় গল্পটির পরতে পরতে সে-সত্যই উন্মোচিত হয়েছে।স্বাধীন দেশে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পেলেও নিম্নবর্গ মানুষ চিকিৎসাসেবার ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নিরুপায় নিম্নবর্গ মানুষ বাঁচার আকুতি নিয়ে হাসপাতালে ভিড় করে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে প্রদর্শন করে ভয়ানক উদাসীনতা। কোনো প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই জমিরুদ্দির উদ্দেশে ডাক্তারের নির্দয় উচ্চারণ 'এ বাঁচবে না। যা হবার হয়ে গিয়েছে।' (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ২৪) কিংবা ট্রেনে পা কাটা যুবকের উদ্দেশ্যে ডাক্তারের নির্মম উচ্চারণ 'পা থেকে মাথা তো বেশি দূরে নয় বাপ। ফস্কালে কি করে?' (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ২৮) কেবল জমিরুদ্দি নয় হাসপাতালে ভর্তি অসংখ্য রোগী এই অব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসাহীনতার শিকার হয়। এসব রোগী ও তাদের স্বজনদের হৃদয়বিদারী আর্তনাদে ভরে ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। গোটা হাসপাতালজুড়ে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা আর চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার চিত্রই প্রতিফলিত হয়। গল্পকারের বর্ণনা এতৎপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়:

> চারপাশ থেকে গোঙানির আওয়াজ আসতে থাকে। এতক্ষণ ঘরটা চুপচাপ ছিলো, এখন নানা দিক থেকে শব্দ ভেসে আসে। জমিরুদ্দির মাথার উপরে লোকটা জখম শুয়োরের মতো একনাগাড়ে চিৎকার করে চললো। কানে তালা লেগে যায় সেই শব্দে, তিন বিছানা দূরে লোকটা হুহু করে কেঁদে উঠে কেবলি বলতে থাকে, দেখবো রে শালা দেখবো, উহুহু, ইহিহিহি, বটে বটে বটে, বা বা বা। রেলে কাটা পড়া ছেলেটার বাপ ছেলের হয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে। মানুষের যন্ত্রণার তরঙ্গে ঘরটা ডুবে গেলে নার্সরা আঁকুপাঁকু করে তীব্র গলায় ধমক লাগায়, চুপ করুন, চুপ করুন, এই এই, কি হচ্ছে! (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ৩১)

নিম্নবর্গের মানুষ চিকিৎসাহীনতার এই অবর্ণনীয় কষ্টের বিপরীতে মনে-প্রাণে মৃত্যুকেই প্রত্যাশা করে; অনেকেই বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। গল্পের সমাজবিপ্লবী শিক্ষিত তরুণ রাশেদ এই অচলাবস্থার অবসান চায়। কিন্তু জমিরুদ্দির সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে তার জরুরি অপারেশনের ব্যবস্থা করতে ডাক্তারকে সে সবরকম অনুরোধ জানালেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অনেক আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার পরেও নিম্নবর্গ মানুষের জীবনে স্বস্তি আসেনি। বরং মাত্র সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে জেঁকে বসে সামরিক শাসন; ঘুষ, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অব্যবস্থাপনা জগদ্দল পাথরের মতো সমগ্র জাতির ওপর চেপে বসে। মূলত এ-গল্পে হাসপাতালের দর্পণে গল্পকার সমগ্র বাংলাদেশের নৈরাজ্যিক সময়ের প্রতীকী চিত্র অঙ্কন করেছেন। কিন্তু গল্পের উপান্তে রাশেদের বিপ্লবাত্মক প্রত্যয়ী আত্মভাবনা এবং ডাক্তারের দিকে 'হিম ঠাণ্ডা চোখে'' জমিরুদ্দির স্ত্রীর তাকানোর ভঙ্গিটি দৃশ্যায়িত করে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন সদর্থক দিনবদলের অগ্নিবার্তা; নিম্নবর্গ মানুষের মুক্তির গতিপথ।

আমরা অপেক্ষা করছি

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সমরশাসকের মদদপুষ্ট ভাড়াটে কুশীলবদের দৌরাত্ম্যে বৃহত্তর জনজীবনে অপশাসন ও শোষণের যে নগ্নরূপ প্রদর্শিত হয়েছিল 'সম্মুখে শান্তি পারাবার'-গল্পে একটি পরিবারের সর্বস্ব হারানোর মধ্য দিয়ে সেই সত্যই উন্মোচন করেছেন গল্পকার। সময় ও সমাজের বহমানতায় হাসান আজিজুল হক প্রত্যক্ষ করেন ক্ষমতার পালাবদলে নিম্নবর্গের মানুষের শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটে না, বরং আবিষ্কৃত হয় শোষণের নব নব পন্থা। বর্ষাস্নাত শ্রাবণ-দিনে কর্মহীন এক নিরন্ন পরিবারে পিতা-পুত্রের বাদানুবাদসূত্রে এ-গল্পে উন্মোচিত হয় নিম্নবর্গ মানুষের বিরামহীন বঞ্চনার প্রসঙ্গ। অস্তিত্ববিনাশী অভাবের যন্ত্রণায় কাতর এ-পরিবারটির ভিটেবাড়ি ছাড়াও অবশিষ্ট একবিঘে জমিও নামমাত্র মূল্যে দখল করে নেয় সরকারি ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত প্রভাবশালী গ্রাম্য মাস্তান। স্থানীয় পর্যায়ে নিম্নবর্গীয় মানুষের ওপর সরকারদলীয় লোকদের শোষণের সর্বগ্রাসী রূপ পরিলক্ষিত হয় জমির দলিল অধিগ্রহণে আগত মাস্তান-মাতব্বরের উচ্চারণে:

> বাপ ছেলে দুজনের দিকেই একসঙ্গে চেয়ে সে বললো, এই রইলো পাঁচশো, আরো পাঁচশো দেবানে যাও। কাল চলো সদরে যাই। সেখানে বাকি পাঁচশো দলিলখানা দাও দিনি, এহানে একটা সই করো দিনি-গরমেন্ট আবার কি? এহানে আমিই গর্মেন্ট, হ, হ, পার্টির কথাই কছচি। তোমরা আবারে কি কচ্ছো? ও ফসলের কতা কচ্ছো? নিয়ো নে যাও অদ্দেক, সেই পোষ মাসে। দেবানে দেবানে, আরে দেবানে কচ্ছি। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ৬৮)

রাতের অন্ধকারে এই মাস্তান-মাতব্বর ফিরে এলে এক পর্যায়ে পিতা-পুত্র তাদের নিকট নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে জমি বিক্রির টাকা তাদেরই হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। টাকা ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে যাবার সময় মাস্তান বাহিনীর একজনের লোলুপদৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আহত কৃষক পিতার অষ্টাদশী কন্যার ওপর। পিতা ও পুত্রের সম্মুখেই কন্যা ও পুত্রবধূর ওপর মাস্তানদলের পাশবিক নির্যাতনে রক্তাক্ত হয় পিতার অন্তর্লোক। সমাজের এই নির্মম অধোগতির চিত্র উপস্থাপন করে হাসান আজিজুল হক দেখিয়েছেন—বৃহত্তর নিম্নবর্গ

জনগোষ্ঠীর জীবনে দেশের স্বাধীনতা, আইন-আদালত সবই নির্মম তামাশার নামান্তর। বিপুল আত্মত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা এদেশের নিম্নবর্গ মানুষের জীবনে যে কোনো অর্থবহ পরিবর্তন সূচিত করেনি গল্পটির প্রতিছত্রে এই সত্যই হয়েছে উন্মোচিত।

রোদে যাবো

নিম্নবর্গ মানুষের পক্ষে বক্তব্য প্রকাশে হাসান আজিজুল হক ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। এটি তাঁর শিল্পিসত্তার অন্যতম গৌরবময় অনুষঙ্গ। এদিক থেকে 'ভূতের কষ্ট'-নামক গল্পটি তাঁর গল্পধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। গল্পটিতে এক অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির আত্মহনন এবং তৎপরবর্তীকালে তার ভূত হিসাবে আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের জীবনবাস্তবতার চিত্র। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে দুঃসহ জীবন কাটছিল তার। কিন্তু পক্ষাধিককালের বর্ষায় তার সংসারে খাদ্যাভাব চরমে পৌঁছলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন সে বোধ করে না। তাই স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করে সে এই অন্নকষ্টের অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সে নিজেই বেছে নেয় আত্মহননের পথ। মৃত্যুর পরও তার অন্নকষ্টের অবসান ঘটে না। সে উপলব্ধি করে মনুষ্যজন্মেষে যন্ত্রণা নিয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করে পরবর্তীকালে ভূত-জীবনে সেই যন্ত্রণা ভিন্ন অন্য কোনো যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হয় না। ফলে 'খিদে নিয়ে হাভাতে মরেছিল। এখন খিদে ছাড়া তার আর কোনো বোধ নেই।' (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ২৫১) বিত্ত ও কর্মহীন হাভাতে নিজের ও পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, অন্যদিকে হাভাতের স্ত্রী আত্মহত্যা না করেও হাভাতের মৃত্যুর দুদিন পরে খাদ্যাভাবে মারা যায়। অর্থাৎ নিরন্ন নিম্নবর্গ মানুষগুলোর জন্য অপমৃত্যুই যেন নিয়তি-নির্ধারিত সত্য। ভূত-জীবনে হাভাতে বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও খাদ্যসংগ্রহে ব্যর্থ হয়। তার অভাবগ্রস্ত জীবনের নির্মম পরিণতির চিত্র উঠে এসেছে গল্পকারের বর্ণনায়:

> মরার পর হাভাতের শরীরে একটি জিনিসই ছিল- তীব্র খিদে। বেঁচে থাকার সময়ে সে শুনেছিল, মরলে সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়। মানুষ খিদেতেষ্টা, রোগযন্ত্রণা, হাগামোতা সব কিছুর উপরে উঠে যায়। মরার পর হাভাতে দেখল সব ভুল। পেট নেই খিদে আছে। পেট থাকলে খিদের চোটে চোখে অন্ধকার দেখে পেটে কাপড় বাঁধা যায়। কিন্তু পেট না থাকলে সেটা করা যায় না। তবে ভূতদের একটা সুবিধের কথা হচ্ছে, তারা যে যা যন্ত্রণা নিয়ে মরেছিল ঠিক সেই যন্ত্রণা ছাড়া অন্য আর কোনো কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করে না। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ২৫১)

হাসান আজিজুল হক এ-গল্পটি রচনা করেন ১৯৮২ সালে। স্বাধীনতার একদশক অতিক্রান্ত হলেও বাংলাদেশের নিম্নবর্গ মানুষের জীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অবসান ঘটেনি।[১] ফলে বৃহত্তর জনজীবনে সৃষ্টি হয় হতাশা, ক্ষোভ ও প্রত্যাশাভঙ্গের বেদনা। হাভাতের মনুষ্যজীবন ও তার ভূত-জীবন এই – দুই জীবন বাংলাদেশের স্বাধীনতার

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুই সময়ের চিহ্ন-নির্ণায়ক। যেখানে স্বাধীনতা কেবল পর্ব থেকে পর্বান্তরে যাওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা জনজীবনে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করে না।

মা-মেয়ের সংসার

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নিম্নবর্গ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর নামে বরাদ্দকৃত সরকারি জমি স্থানীয় প্রভাবশালীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও জাগরণ এবং শোষিত জনগোষ্ঠীর আত্ম-উজ্জীবন ও শোষকশ্রেণির নির্মম পরাভবের কথকতা 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত'। ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাস জমি বণ্টনের সরকারি সিদ্ধান্তে তিন বিঘা জমি বরাদ্দ হয় এক গ্রাম্য জোতদারের বশংবদ একামতউল্লার নামে। একামতউল্লার কাছে জমিপ্রাপ্তির সংবাদ নিয়ে আসেন স্থানীয় সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন। এতদিন জোতদারের স্বার্থোদ্ধারে ব্যস্ত থাকলেও এ-পর্যায়ে একামতউল্লা হয়ে ওঠে অধিকারসচেতন। তাই জোতদারের সঙ্গে বাক্যালাপে তার অধিকারচেতনা ও প্রতিবাদী মানসিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যায়:

> জমিটা হামারে দ্যান মালিক। আপনার তো অভাব নেই। অত খাইবেন না, প্যাটত্ জায়গ হইবে না।...
> জমি লইয়া কি করিবেন বাহে তোমরা! গরু-মহিষ নাই, সার-বীজ নাই। জমি তো পড়ি থাকিবে।
> জমিটা তাহলে হামার কহেন মালিক।
> তুমারা কি হামার নহে? তুমার বউ কি হামার নহে?
> হামার বউ হামার মালিক।
> কথা তো একই বাহে। তুমি হামার নহিস? তুমার বিহার পরে তুমার বউ কি হামার ছিল না?
> জমি হামার কিনা কহেন ভীষণ উগ্র গর্জন করে ওঠে একামতউল্লা। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ১৩৬)

একামতউল্লার ক্রিয়াকলাপে বোকামি বা সারল্য থাকলেও পরবর্তীকালে তার কর্মকাণ্ডে অধিকারবোধ তীব্র হয়ে ওঠে, তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও শোনা যায়। (সরিফা, ২০১০: ২৪৮) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একামতউল্লা বারংবার তার জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জোর দাবি জানালে জোতদার ক্রমশ হয়ে পড়ে 'উত্ত্যক্ত আর কোণঠাসা'। একামতউল্লার এই জাগরণী ভূমিকার কারণে তার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে গ্রামের একামত, তাকিবুল, নছর, ফিরু প্রমুখ প্রতিবাদী যুবক, এবং তারা সঙ্ঘশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। নিম্নবর্গীয় এসব মানুষের সঙ্ঘশক্তির বিপরীতে জোতদারের অবস্থান ক্রমশ হয়ে পড়ে নাজুক। সমাজের শোষিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষ যদি নিজেদের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হয় তবে শোষকশক্তির পরাভব হয়ে ওঠে অনিবার্য-এই সত্যটিই 'মাটি পাষাণের বৃত্তান্ত'-গল্পে প্রতিপাদনের প্রয়াস পেয়েছেন গল্পকার।

আবহমান বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় ভূমিহীন নিম্নবর্গের মানুষ স্থানীয় ভূস্বামীদের মজুরি করেই গ্রাসাচ্ছাদন করে। 'বিলি ব্যবস্থা' গল্পে এরকমই বঞ্চিত মানুষের ওপর স্থানীয় জোতদারের নিষ্পেষণের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ-গল্পে নেক বখেশর মালিকানাবিহীন খাস জমিতে সরিষা চাষের উদ্যোগ প্রকারান্তরে ভূমিদাসবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে তার স্বনির্ভর জীবনাকাঙ্ক্ষাকেই প্রকটিত করে। কিন্তু জোতদার তার শোষণের ধারা টিকিয়ে রাখতে সদা তৎপর। ফলে খাসজমির উৎপন্ন ফসলের শেষ গন্তব্য হয় মালিকের খামার। নিজের উৎপন্ন ফসল মালিকের খামারে পৌঁছে দিয়েও তার মুক্তি নেই। কারণ মালিকের খোড়া 'নুলো' ছেলের সন্তান এখন তার বোন নেকীর গর্ভে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে মালিকের ছেলের সঙ্গে নেকীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে মালিকের সম্মুখে উপস্থিত হলে অবজ্ঞা ও ঘৃণায় মালিক তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। অতঃপর নেক বখ্‌শ ও মালিকের কথোপকথনসূত্রে শ্রেণিদ্বন্দ্বের যে নিগূঢ়ভাষ্য উন্মোচিত হয়েছে তা বাংলাদেশের সমাজসত্যেরই চিরায়ত প্রকাশ:

> মালিক, আমি গরিব, আপনি না মারলেও এমনি এমনি মরি যাবো। কদিন বাঁচবার চাই। বাঁচো না ক্যান্ বাহে, কে ঠেকায়। আপনার ছোঁয়াটার সঙ্গে বুনটার বিয়া দিয়া দ্যান মালিক। কাজটা তো ওঁয়া করিছে। তুই দেখেছিস ওঁয়া করিছে। আমার ছোঁয়া তোর বুনকে ছুঁইয়া দেখিবে? ছোটমুখে বড় কতা। তুই মোর জবান ছিঁড়া নিব। এ কথার পরেও নেক বখশ থামে নি। আমার বুন আর আপনের বেগমে ফারাক কি মালিক-অনেক তো দেখিছেন তুমরা, সময়কালে মিয়ের মিয়ের ফারাক কিছু নাই মালিক। আপনার ছোঁয়ার ঠ্যাংটা ল্যাঙরা, হাতটা নুলো, মুখ দিয়ে লালা গড়ায়- তবে কি সে মিয়েমানুষ চিনে না? (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ১৬৭)

এ সময় মালিক তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়—তার ছেলে খোঁড়া ও নুলো হলেও সে 'মানুষ'; কিন্তু নেক বখ্‌শ এবং তার বোন তা নয়; কারণ তারা 'ছোটজাত, কুকুর, কমিন'। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ১৬৭) নেক বখ্‌শকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েও জোতদার স্বস্তি পায় না; গ্রামের ইমামের সহযোগিতায় সন্তানসম্ভবা নেকীর শাস্তিবিধানে সে তাই জারি করে ফতোয়া। এভাবে সমাজশক্তি ও ধর্মশক্তির জাঁতাকলে পিষ্ট হয় নেক বখ্‌শ এবং তার বোনের মতো নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন। গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজে যুগ-যুগান্তর ধরে নেক বখেশরা নিগৃহীত ও নিপীড়িত হলেও তারা প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে পারে না—গল্পটিতে এ-সমাজসত্যই শিল্পমূল্য পেয়েছে।

এক অভাবগ্রস্ত কুমারী নারীর মাতৃসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়ার আখ্যান হাসান আজিজুল হকের 'জননী'-গল্পের মৌল বিষয়। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুমারী নারীর জীবনেও যে মাতৃত্বের মহত্তর মর্যাদা সমুন্নত থাকে তা এ-গল্পে ভাষারূপ পেয়েছে। মাতৃত্বের গৌরব এ-গল্পের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হলেও সমাজে অসহায় নিম্নবর্গীয় নারীরা যে প্রতিনিয়ত পুরুষের পাশবিক লালসার শিকার হয়ে সমাজপরিসরে যাপন করে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত জীবন সেই সত্যকেও উন্মোচন করেছেন গল্পকার। প্রাসঙ্গিক গল্পাংশ লক্ষণীয়:

> পরের দিন আয়েশা এলে আমার স্ত্রী বলেন তোকে আর রাখতে পারছি না। নিজের জিনিসপত্র যা আছে নিয়ে চলে যা আমার বাড়ি থকে দূর হয়ে যা। আয়েশা কোনো কথা না বলে ময়লা একটা শাড়ি, রঙ-জ্বলা একটা গামছা আর এমনি টুকিটাকি দুচারটা জিনিস হাতে তুলে নিয়ে আমার স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায়। তার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটি মেলে সে বলে, যেচি, আমার এ মাসের যা পাওনা হয়েছে দিবেন না? (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ১৮১)

রুটি-রুজির প্রশ্নে আয়েশা অন্যের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নিলেও পুরুষশাসিত সমাজে নিম্নবর্গ এই নারীর কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট থাকেনি। গল্পকার মাতৃত্বের বিষয়টিকে উচ্চমূল্য দিলেও আয়েশার বিড়ম্বিত নারী-জীবন এবং অন্তর্নিহিত হাহাকারও সমান্তরালভাবে এ-গল্পে তুলে ধরেছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন মা-মেয়ের ওপর সমাজশক্তির জান্তব আগ্রাসনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে 'মা-মেয়ের সংসার'-নামক গল্পে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্রোপকূলবর্তী সুন্দরবনের বিপদসংকুল প্রতিবেশে অসহায় এক মা ও তার মেয়ে কীভাবে গ্রাম্য বখাটে যুবকদল কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং কীভাবে সমাজশক্তি তাদেরকেই আবার ফতোয়া জারি করে শাস্তিবিধানে তৎপর হয়ে ওঠে, তা এ-গল্পে বর্ণিত হয়েছে। সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতা-মানবিচারের সবগুলো মাপকাঠির তলানিতে অবস্থান করা আত্মীয় পরিজনহীন মা-মেয়ে লোকালয় থেকে দূরবর্তী স্থানে গড়ে তুলেছে তাদের নিজস্ব সংসার। এক সন্ধ্যায় আকস্মিকভাবে চারজন পুরুষের একটি দল মেয়েটিকে অপহরণ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করলে মেয়েটি জ্ঞান হারায়। মেয়ের মতো মাকেও বরণ করতে হয় একই পরিণতি। একসময় মা-মেয়ে উভয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অতঃপর তাদের দুঃখজর্জর জীবনে শুরু হয় নতুন সংকট। গ্রাম্য মোড়লরা ছুটে আসে এই 'ধর্মবিরুদ্ধ' কর্মের শাস্তিবিধানে। কিন্তু মায়ের প্রতিবাদী উচ্চারণে উন্মোচিত হয় তাদের সমাজপতিদের প্রকৃত স্বরূপ:

> আল্লার লগে তোমাদের কতা হয়? হ্যাঁ, হয়। সে বিটা কি কয়? খবরদার ছিনাল মাগী, মুখ সামলে কথা কবি। সে বিটা কি কয় জানা নেই না! কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে খতম করতি হবে তোদের। সেই ব্যবস্থায় করোগে তোমরা। তোমাদের পোলাগুলারেও নিয়ে আসবা। ওদের মাটিতে পোতবা মাথা থেকে কোমর ইস্তক। আল্লা নেই তাই আল্লার কথা কচ্ছো। থাকলি এতক্ষণে ঠাঠায় পুড়ে কেলায়া থাকতা। (হাসান, ২য় খণ্ড, ২০১৮: ১৪৪)

গল্পকার আধিপত্যকামী শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গ নারীর প্রতিবাদী চেতনায় জাগরণ ও তাদের অস্তিত্ব-অভীপ্সার চিত্রকে এ-গল্পেও রেখেছেন বহমান। এই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মধ্যেই গল্পকার সন্ধান করেছেন নিম্নবর্গীয় মানুষের টিকে থাকার শেষ সম্ভাবনা-সূত্র।

হাসান আজিজুল হকের শিল্পসত্তার মূলে আছে মানুষ; বিশেষত সামাজিক ও আর্থিকভাবে অনগ্রসর নিম্নবর্গের মানুষ। সাহিত্যসাধনার সূচনা-পর্ব থেকেই হাসান তাঁর গল্পশিল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের অস্তিত্বসংকট ও অস্তিত্বসাধনাকে করে তুলেছেন তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। স্বাধীনতা-উত্তরকালে নিম্নবর্গ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকট উদ্ঘাটন করে হাসান এই শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রাঙ্কনে যে সহানুভূতি, অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্য ও বাস্তবতাবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে তার দ্বিতীয় তুলনা বিরল।

তথ্যনির্দেশ

১. এক সাক্ষাৎকারে হাসান আজিজুল হক জানিয়েছেন: একাত্তরে একটি সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। কিন্তু তারপরও যখন সে সবের পাশে বাস্তবতাটাকে রাখি তখন মনে হয় না, এখনো সেই ক্ষুধা, এখনো সেই দারিদ্র্য, এখনো সেই শোষণ আমাদের সমাজের মূল সংবাদ।...কাজেই সেই মৃত্যু আর ক্ষুধাই আমাদের সমাজ। (হায়াৎ, ২০১১: ২৪৫-২৪৬)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আবু জাফর, ১৯৯৬। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

চন্দন আনোয়ার, [সম্পা.] ২০১৫। *হাসান আজিজুল হক নিবিড় অবলোকন,* কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

বোরহান বুলবুল, ২০১৪। *বাংলাদেশের নাটকে নিম্নবর্গ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ, ২০১৮। *হাসান আজিজুল হক: রাঢ়বঙ্গের উত্তরাধিকার,* লিটল ম্যাগাজিন, চট্টগ্রাম।

মিল্টন বিশ্বাস, ২০০৯। *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে নিম্নবর্গের মানুষ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সরিফা সালোয়া ডিনা, ২০১০। *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প বিষয় ও প্রকরণ,* বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হায়াৎ মামুদ, [সম্পা.] ২০১১। *উন্মোচিত হাসান: হাসান আজিজুল হকের আলাপচারিতা,* ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা।

হাসান আজিজুল হক, ২০১৮। *গল্পসমগ্র* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা। হাসান

আজিজুল হক, ২০১৮। *গল্পসমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড), তৃতীয় মুদ্রণ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।